নোয়াখালীঃ কল্পলোকের গল্পকথা (৯)

পরশপাথর

কোথাও ঘুরতে গেলে তথাকথিত শিক্ষিতলোকদের সাধারণত আমি এড়িয়েই চলি। শিক্ষিতলোক দেখবার জন্য কিংবা তাদের অমৃতবাণী শ্রবণ করবার জন্য শহরগুলিতে এখন তৈরি হয়েছে বড় বড় অডিটোরিয়াম। বিভিন্নধরণের গোল আর গালটেবিল বৈঠকতো প্রতিনিয়ত লেগেই আছেই। অতএব, গ্রামের শান্ত মনোরম পরিবেশটায় তাদের উৎপাত না থাকলেই ভালো। তাছাড়া তাদের কথাও হয় মোটামুটি একই ধরণের। কেন তারা জীবনে প্রচুর টাকা না পেলেও শুধু আদর্শ আরা নীতির কারণে এখনও চরম মানসিক সুখ নিয়ে বসবাস করছে, চাইলে তারা জীবনে কোটি কোটি টাকার মালিক হতে পারত, কিন্তু অর্থের চেয়ে জীবনে নীতির মূল্য অনেক বেশি, তাই তারা অর্থ বিসর্জন দিয়েছে কিন্তু নীতি বিসর্জন দেয়নি - এইসব পুরোনো কথা। এত দুঃখ ভারাক্রান্ত মুখ নিয়ে তারা তাদের সুখের কথাগুলি বলে-যে শুনতে ইচ্ছে করেনা। তাই বলে এ-অঞ্চলে এসেও আপনি তাদের কথা শুনবেন না, তাতো হতে পারেনা। কি করে শ্রোতা ধরে রাখতে হয় এদের থেকে বেশি সেটা কে আর জানে? অতএব, বাড়াবাড়ি না করে শুনে ফেলাটাই মঙ্গলজনক।

এই লোকটিকে বেশ পড়ুয়া বলেই মনে হোলো। ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে ভালোই দক্ষতা। প্রথমেই বলে দিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইতিহাস, নৃতত্ত্ব জাতীয় বিষয়গুলি কেন পড়ানো হয় এটা তিনি আদৌ বুঝতে পারেন না। খুব ভালোই বুঝতে পারলাম, বহুদিন যাবত উনি উনার এই তত্ত্ব প্রকাশ করার উপযুক্ত লোক খুঁজে পাচ্ছেন না, এখন আমাকেই সেটার আগাগোড়া হজম করতে হবে। উনার দাবী অনুযায়ী, এরা ত্রিশ বছর গবেষণা করে যেটা বের করে আনেন সেটা নাকি বিশ্বমানচিত্র দেখে পাড়ার চায়ের দোকানদারটাও দুই মিনিটে বলে দিতে পারবে। ঠিক কি রকম তার একটু ব্যাখ্যা চাইতে গিয়েই পড়লাম বিপদে। আমাকে বললো, বলেনতো দেখি জাপানের পাশে কোন কোন দেশ আছে? আমি অনেক কষ্টে সৃষ্টে বললাম চীন, রাশিয়া। উনি আরেকটা যোগ করে বললেন আর দক্ষিণ কোরিয়া। কিসের জন্য কি জিজ্ঞেস করছে কিছুই যখন বুঝতে পারছিনা; তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বলেনতো জাপানের আদি অধিবাসীরা কোন দেশ থেকে সে দেশে গিয়ে বাসস্থান গড়েছে? আমি বললাম জানিনা। উনি বললেন, 'আমিও জানিনা'। তবে আপনি নিশ্চিত থাকেন আপনি মোট তিন ধরণের মতবাদ পাবেন, যেটা মতবাদ দানকারীরা বছরের পর বছর গবেষণা করে বের করেছে। তাদের একদল বলবে জাপান জাতির পূর্বপুরুষ এসেছে 'চীন' দেশ থেকে, আরেক দল বলবে 'দক্ষিণ কোরিয়া' থেকে। বলেন দেখি আরেকদল বলবে কোন দেশ থেকে এসেছে? আমার মুখ দিয়ে খুব দ্রুত বুলেটের গতিতে বেরিয়ে গেল 'রাশিয়া' থেকে। অনেক দিন পর নিজেকে প্রাইমারী স্কুলের স্টুডেন্ট মনে হল। আমাদের স্যার জোরে জোরে বলতেন, দুইয়ে একে দুই, আমরাও বলতাম সাথে সাথে। তারপর স্যার বলতেন, দুই দু'গুনে...? আমার সবাই সমস্বরে বুলেটের গতিতে বলে ফেলতাম চাআআআ...র। আসলে এদের চিন্তা ভাবনার স্টাইলটাই আলাদা।

এবার আসা যাক আরেকজনের কথায়। ভদ্রলোক স্থানীয় কলেজের শিক্ষক। বার বার উনি যে ব্যাপারটা বুঝাতে চাচ্ছেন তা হলো, বায়োলজির শিক্ষক হলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই যেখানে তার অবাধ বিচরণ নেই। ডারউইন যে কত বড় একটা মিথ্যাবাদী এবং নষ্ট চরিত্রের মানুষ সেটা তিনি প্রমাণ করে দিলেন এক নিমিষেই। নিউটন যে একটা বড় মাপের চোর সে-খবর এ-অঞ্চলে উনিই প্রথম স্টুডেন্টদের শুনিয়েছেন। এতবড় সত্য কথাটা উনি এখানে না আসলে সবার কাছে একরকম অজানাই থেকে যেত। তারপর যা-হয় আর কি, তিনি সোজা চলে গেলেন দেশের ভবিষ্যত প্রসঙ্গে। জ্ঞানী মানুষদের এ-এক অভ্যাস, তারা দেশের চিন্তা ছাড়া থাকতে পারেন না। মাননীয় শিক্ষক

মহোদয় মোটামুটি গবেষণা করেই বের করেছেন যে, একটা সেক্টরই এখন অবশিষ্ট আছে যেটা দিয়ে এ-দেশের ভাগ্য পরিবর্তন সম্ভব, অন্য আর কিছু দিয়েই সম্ভব নয়। সেটি হচ্ছে আইটি সেক্টর। কিন্তু সাথে সাথে তিনি তার দুঃশ্চিন্তার কথাটা জানাতেও ভুললেন না। কিছু দুষ্টুলোক আর তাদের তৈরী ভাইরাসের আক্রমনে এ সম্ভাবনাময় খাতটিও নষ্ট হতে চলেছে, যার বিরুদ্ধে এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ। ভাইরাস প্রসঙ্গে তারপর যে কথাটি তিনি বললেন সেটা শুনে আমার মনে হলো একটু পরেই বুঝি ভূমিকম্প হতে শুরু করবে। ধানমন্ডি এলাকায় তিনি নিজের চোখে দেখে এসেছেন, একটা গ্যাং কি-বোর্ডের ভিতর ইনজেকশান দিয়ে ভাইরাস ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তিনি আরো বলে গেলেন এই ধরণের অপতৎপরতা রুখতে হলে সকলকে এককাতারে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হবে। আমি হতভম্ব হয়ে শুধু উনার চোখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলাম আর মনে মনে ভাবলাম জীবনানন্দ দাসের মা কুসুমকুমারী দাসকে। যিনি লিখেছিলেন, ‘আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।’

এবার একটু অন্য কথা বলি। ক্রীড়াঙ্গনের কথা। আগে যে ছেলেটি তার স্কুল শেষে বাবাকে তার ক্ষেতের কাজে সহায়তা করত, সে এখন আর তা করেনা। সে এখন ক্রিকেট খেলে। ফুটবলের মত এক ঘণ্টায় শেষ হবার খেলা এটি নয়। লাগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে বাবা তাতে রাগ করছেনা একটুকুও। বরং বাবাই ক্ষেতের কাজ ফেলে রেখে মাঠে বসে ছেলের খেলা দেখছে। বছরজুড়ে এখানে হয় বিভিন্ন ধরণের গোল্ড কাপ প্রতিযোগিতা। মৌসুমে বিভিন্ন দামে বিক্রি হয় খেলোয়াড়রা। বিভিন্ন জায়গা থেকে হায়ার করে আনা হয় খেলোয়াড়। এখানকার লোকজন ‘প’ অথবা ‘ফ’ কে বলে ‘হ’। ‘পানি’ হয়ে যায় ‘হানি’, ‘ফুল’ হয়ে যায় ‘হুল’। কিন্তু কোন এক অদ্ভুত কারণে তারা ‘হায়ার’(ভাড়া)কে বলবে ‘ফায়ার’। খেলা শুরুর আগেই সবাই খবর নিবে ‘ফায়ারে’ কতজন এসেছে? শব্দ নিয়ে এদের এ-এক আজগুবি হেয়ালিপনা।

ফুটবলের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ‘জোনাল’ খেলা। থানা পর্যায়ে স্কুলগুলোর মাঝে যারা চ্যাম্পিয়ান হবে তারা যাবে জেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতা করতে। এ-এক উৎসবের উপলক্ষ। বড় গাড়ী ভাড়া করে ছেলেগুলোকে পাঠিয়ে দেয়া হয় জেলা সদরে। তারপর পুরো এলাকাবাসী তাদের ফিরে আসা পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বসে থাকে। কেন জানেন? বেশিরভাগ সময় খেলোওয়াড়রা বাসায় ফিরে আসেনা, তাদের আশ্রয় হয় হাসপাতালে। কখনও তাদের মার খেতে হয় থানা থেকে জেলাতে খেলতে যাওয়ার দুঃসাহস দেখানোর জন্য, কখনো মার খেতে হয় জেলা দলের জালে কোনোভাবে একটি গোল দিয়ে ফেলবার অপরাধের জন্য, কখনো মার খেতে হয় নিজের অজান্তে করে ফেলা ফাউলের জন্য। এটা মোটামুটি অলিখিত নিয়ম। মগের মুল্লুকও বলতে পারেন। মার তাদের খেতেই হবে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, যত মারই দেয়া হোকনা কেন, তারা ঠিকই যায়, তারা যায় অংশগ্রহণ করতে। আর সে মারামারির রোমাঞ্চকর কাহিনী এ-মুখে ও-মুখে ফিরতে থাকে দিনের পরে দিন।

বছরের আরেকটা দিন আছে, যে-দিন এখানকার এলাকাবাসী একসাথে গাড়িভাড়া করে রওয়ানা হয়। তবে এবার আর উৎসবের আমেজ নিয়ে নয়। বরং দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে। এরা অকৃতজ্ঞ নয়। এরা সম্মান জানাতে জানে। এরা সম্মান জানাতে যায়, শ্রদ্ধা জানাতে যায়। জাতি হিসেবে আমাদের লজ্জা পাবার মত অনেক উপলক্ষই আছে। কিন্তু এওতো সত্য যে একটা ইতিহাস আমাদের আছে, যার স্মৃতি মনে করে গর্বে আমাদের বুকটা ভরে উঠে। যে ঘটনা থেকে সাহস সঞ্চার করে আজো আমরা এগিয়ে যাবার প্রত্যয় ব্যক্ত করি। আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস, বিজয়ের ইতহাস। একাত্তরের শহীদদের স্মরণ করতে এরা সবাই একযোগে চলে যায় তাদের মিনারে। সকালবেলায় ছোট শিশু তার বাবার সাথে হাঁটতে বের হয়, আর এত লোক একসাথে দেখে হয়তো তার বাবাকে জিজ্ঞেস করে, ‘বাবা এরা কোথায় যায়?’ তার বাবা বলে, ‘এরা শহীদদের সম্মান জানাতে যায়।’ শিশু বলে, ‘বাবা শহীদ কারা?’ বাবা বলে, ‘আমাদের প্রিয় এই দেশকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য যারা জীবন দিয়েছিলো, তারাই শহীদ।’ শিশু ভাবে, ‘তাহলে নিজের দেশকে বাঁচানোর জন্য মাঝে মাঝে জীবনও দিয়ে দিতে হয়।’

হয়তো এভাবেই জন্ম হয় বোধের, জন্ম হয় বিবেকের, জন্ম হয় চেতনার। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে, বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা, আমরা তোমাদের ভুলবো না। আমরা যে তোমাদের ভুলতে পারিনা।
...

poroshpathor81@yahoo.com
May11, 2008

আর যদি লিখে উঠতে না পারি তাহলে এটিই 'কল্পলোকের গল্পকথার' শেষ পর্ব। লিখা যাবে অনেক, আগেই বলেছি প্রতিটি মানুষই এক-একটি মহাকাব্য। কিন্তু একসময় থামতেতো হবেই। আগের সব পর্ব থেকে আমি যে লাইনগুলি বিভিন্ন কারণে বাদ দিয়েছি সেগুলো দিয়ে দশম সমাপ্তি পর্বটি লিখব। তবে সেটি কোনো মৌলিক পর্ব হবেনা।

সবাই ভালো থাকুন।
-পরশ